## সাক্ষাৎকার: তন্ময় ভট্টাচার্য

### গ্রহীতা: অর্ণব বসু

অর্ণব: তোমার লেখালেখি ২০১০-পরবর্তী সময় থেকে শুরু। প্রায় পনেরো বছর কিংবা কাছাকাছি সময় ধরা যায়। এই চর্চার সময়টাকে যদি সামগ্রিকভাবে দেখি, তাহলে দেখতে পাব তুমি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলাদা-আলাদা কাজ করেছ। একদিক থেকে তুমি কবি, আবার আরেক দিক থেকে তুমি গবেষক, প্রাবন্ধিক। সেই গবেষণামূলক কাজটা ইতিহাসধর্মী। আরেক দিক থেকে তুমি গদ্যকার। আমার প্রশ্ন— এর মধ্যে কোন দিকটা নিয়ে চর্চা করতে তুমি স্বচ্ছন্দ বোধ করো বা আগ্রহ বেশি?

তন্ময়: প্রথমেই স্পষ্টত বলি, স্বাচ্ছন্দ্য বলতে, শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের যৌথ ফসল হল যে-কোনো গদ্য বা প্রবন্ধ লেখা। মানসিক পরিশ্রম বা অবচেতন পরিশ্রম কবিতার। তো সার্বিকভাবে দেখতে গেলে, স্বাচ্ছন্দ্য বলতে যেটায় সার্বিক পরিশ্রম কম হয়, অর্থাৎ কবিতা। এবার যদি প্রশ্ন হয় আমি কোনটাকে এগিয়ে রাখব, তাহলে আমি অবশ্যই বলব— কবিতা। ভবিষ্যতে চেষ্টা করব কবিতা এবং নন-ফিকশন একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, কোনো একটাকে যদি কম্প্রোমাইজ করতে হয়, তাহলে আমি দ্বিতীয়টার সঙ্গেই কম্প্রোমাইজ করব, কবিতার সঙ্গে নয়।

অর্ণব: তোমার প্রথম দিকের বইগুলোতে যদি লক্ষ করা যায়, যেমন— 'নিজস্ব জেলখানা ঘিরে' বা তোমার পরবর্তী বেশ-কিছু বই যেগুলো এখন পাওয়াও যায় না, কিছু বই মানুষ কম পড়েছে। সেগুলো দেখলে দেখা যায় তোমার লেখালেখির শুরুর দিকটা মূলত গদ্য নির্ভর। একটা কবির যথেষ্ট সময় যখন কাটানো উচিত তখন তোমার



'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে'-এর কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়, বিভিন্ন জায়গায় তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। একজন ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রিধারীর কবিতা লেখা, গদ্য লেখা, লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি করা, ইতিহাসচর্চা মূলত বেলঘরিয়া— যেখানে তোমার বাসস্থান সেখানকার ইতিহাস লেখা কীভাবে তোমার মাথায় আসে? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই জায়গাগুলো তুমি দেখতে চাও?

তন্ময়: আমরা যে-সময় লিখতে আসছি সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। লিখতে যে পারি কিংবা পাঠক আমার লেখা পড়ছেন এই সেন্সটা তো সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই এসেছে— অন্তত আমার। যদি লেখার কথা বলা হয় তাহলে আমার ক্লাস ফোর ফাইভ থেকেই, যদিও সেগুলো কবিতা পদবাচ্য নয়। সেগুলো যে প্রকাশ করা যায়, পত্র-পত্রিকায় ছাপা যায় কিংবা লিটল ম্যাগাজিন বলে কিছু আছে সেই ধারণা আমার এই সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই। কবিতাই তো প্রধান, তার পাশাপাশি গদ্যচর্চাও করতাম— তারই পরিবর্ধিত ফসল হয়তো এই 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে'। আমি যে জায়গায় থাকি, যে জায়গায় জন্মেছি তার ইতিহাস, বিবর্তন ইত্যাদি আমি জানব না! আমি ইতিহাস ভালোবাসি, সেই থেকেই লিখে ফেলা। বেলঘরিয়ার ইতিহাসের বই ছিল না আগে, কয়েকটা প্রবন্ধ ছিল স্থানীয় ম্যাগাজিনে, সেই জায়গা থেকেই আমার বিস্তারে কাজ করার ইচ্ছা জাগে। তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো সংঘাত হয়েছে বলে আমি মনে করিনি, এটা আমার কোনো ক্ষতি করেনি তার থেকেও বড়ো কথা আমি পাত্তা দিইনি। আমি যদি ক্লাস টুয়েলভেই পড়াশোনা শেষ করে দিতাম তাতেও আলাদা কিছু হত না মনে হয়, কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চার বছর বা কলেজে পড়াশোনা লেখালেখির দিকে প্রত্যক্ষ কোনও উপকার করেনি!

অর্ণব: তোমার সম্পূর্ণ সময়কালকে লক্ষ করলে দেখা যায় এই বেলঘরিয়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ করা এবং প্যারালালি বাংলা কবিতাকে চর্চা করা একান্তে নিভৃতে বয়ে নিয়ে চলা। দেখা যায় 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে' একটা পাঠকপ্রিয়তা পায়। তো এই যে তৃপ্তি বা আনন্দ, এটাই কি তোমাকে পরবর্তী গবেষণার কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল?

তন্ময়: যে-কোনো কবিতাপ্রয়াসীর মতো আমারও ইচ্ছে ছিল— আমার প্রথম বই হবে কবিতার। কিন্তু পাকেচক্রে প্রথম বই হয়ে দাঁড়াল 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে'। 'সুবিমল বসাক সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড আমার সম্পাদিত প্রথম বই, ওটা সরিয়ে রাখলেও ২০১৬-র মাঝামাঝি বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে। এতদিনে প্রায় ১০ বছর হয়ে গেল তারও। আমার ইতিহাসচর্চা বা নন-ফিকশন চর্চার বিষয়গুলো সব সময় আমার নিজের পছন্দের জিনিস নিয়েই হয়। এই জায়গায় আমার স্বাধীনতা অনেকটা। অনেক প্রকাশকের কাছ থেকে প্রস্তাব আসে এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করুন, এটা সম্পাদনা করুন, আমি সেগুলো সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। আমার পরবর্তী কাজগুলোর জন্য সাহস পাওয়া কিছুটা এই বেলঘরিয়ার বইটা থেকেই। নিজের পছন্দমতো কাজ কোনো বাঁধা-ধরা পথে না করেও যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়— সেই ভাবনা আমার এখান থেকেই এসেছে।

অর্ণব: ২০১৭ সালে প্রকাশিত 'আত্মানং বিদ্ধি' একটা অন্য ধরনের গদ্যের বই, লক্ষ করলে দেখা যায় সেখানে অনেক কবিতার অনুষঙ্গ এসেছে। আবার দেখা যায় বিশেষ কিছু অলংকরণ এসেছে। এই বইটা নিয়ে কি তোমার আলাদা কিছু ভাবনা ছিল? এই জায়গায় আমার আর একটি প্রশ্ন থাকবে 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে' এবং তার পরবর্তীতে কয়েকটি কবিতার বই তারপর এই বইটি, এই যে একটা বই থেকে আরেকটা বইয়ের ট্রান্সফারটা কীরকম নন-ফিকশনের ক্ষেত্রে?

তন্ময়: 'আত্মানং বিদ্ধি' বইটার আলোচনায় এই প্রথমেই উঠে আসে ভাষার কথা। ২০১৩ থেকে ২০২০ পর্যন্ত আমি এক ধরনের গদ্যের চর্চা করেছি। সেই ধারার শেষ ফসল বলে আমি মনে করি 'দিনান্তের সৎকারগুচ্ছ অথবা আত্মহনন-পদ্ধতি' বইটিকে। ওই বইটিতে আমি নিজেকে নিঃশেষ করে ওই গদ্যভাষা থেকে সরে এসেছি, আমার কোনো আক্ষেপ নেই তা নিয়ে। এই বইয়ে আমি আমার ভাঁড়ার পুরো উপুড় করে দিয়েছি। এরপর থেকে এই ধাঁচে লিখলে বড়ো রিপিটেড মনে হত নিজেকে। 'আত্মানং বিদ্ধি'-র বিষয় হল একটা ছেলের দেশভাগের ৭০ বছর পর শিকড় খুঁজতে পূর্ববঙ্গে যাওয়া। এর ভেতর আমার ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠার আবেগ তো কাজ করেছেই। ২০২৫-শে দাঁড়িয়ে ওই লেখা আমি কোনোদিন লিখতে পারব না



কারণ ওই মনটাই আর নেই। ফলে তো সময়ের নিরিখে, বিষয়ের নিরিখে, তৎকালীন ভাবনার নিরিখে এবং ঠাকুমা প্রয়াত হয়েছিলেন তার বছর তিনেক আগে, তার ক্ষত— সবকিছু মিলিয়ে ওই বইটা। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে আমার যে নন-ফিকশন চর্চা তার মূল হচ্ছে অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ এবং তার বিশ্লেষণ। এই তিনটিকে যদি মূল হিসেবে ধরি তাহলে এই বইয়ে সেগুলো রয়েছে। এই বইটি একটি সিঁড়িও।

অর্ণব: এই বইটা ভিটেমাটির গল্প কথা বলে, বিশেষ কিছু জায়গায় অনেকটা কবিতা উঠে এসেছে। তো যখন তোমার কাছে যখন শব্দ এসেছে কবিতার মধ্যে তা গদ্যের মধ্যেই আসুক কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল কবিতার মধ্যেই আসুক। সেই শব্দটা তোমার কাছে খুব অবচেতন থেকে উঠে আসে, নাকি কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কথ্যভাষাগুলো তোমার কবিতার মধ্যে ঢোকানোর একটা নির্মাণধর্মী প্রয়াসও থেকে যায়?

তন্ময়: 'আত্মানং বিদ্ধি'-কে যদি ধরি, তাহলে আমি যে শব্দ ব্যবহার করেছি, সেটা বাংলাভাষার বাইরে বলে মনে করি না। হয়তো পশ্চিমবঙ্গের শব্দ নয় ওপার বাংলার শব্দ। ওপার বাংলায় সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে এইসব শব্দের প্রচলন রয়েছে। আমি যদি হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালির জায়গা থেকেই দিকটা আলাদা করতে চাই, তাহলেও সংখ্যাগুরু মুসলমান বাঙালি, সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

অর্ণব: হ্যাঁ রিশতা, মেহমান বা এইধরনের শব্দবন্ধের ব্যবহার এবং দেখা যায় বইটা ২০১৭ সালে দাঁড়িয়ে লেখা, আমরা বর্তমানে এই ধরনের ভাষা ব্যবহারের প্রতি যে বিরূপতা— অবশ্যই সেটি রাজনৈতিক বিরূপতা বা রাজনৈতিকভাবে একধরনের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, তো সেইসময় দাঁড়িয়ে ভাষাগুলোকে যত সহজে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও কি গিয়ে আজকে মনে হয় যে এর পাশাপাশি এই ধরনের বই বা এই ধরনের লাইন আলাদা কোনো মাত্রা বা গুরুত্ব এখনও বহন করে?

তন্ময়: প্রথম কথা, তোর অ্যাঙ্গেলটা তো এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয় কথা সার্বিকভাবে আমি মনে করি যে-কোনো বিষয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিআবেগটাকে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। ব্যক্তিগত কথা বলতে গেলে তো আবেগ আসবেই, কিন্তু সেটার উপস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত

হওয়া উচিত। সেই বয়সের আমি, সেটা এই বইয়ে করতে পারিনি। সেটা একটা ব্যার্থতা, কারণ বিষয়টাই আমার কাছে একটা আবেগের বিষয় ছিল, দেশভাগ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য। সেইটাকে এখন যতটা লজিক্যালি এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে ভাবতে পারি, তখন সেটা বড়ো ব্যক্তিকভাবে ভাবতাম। তারপরের কথা হচ্ছে এই জাতীয় শব্দ, আমার যতদূর মনে পড়ছে আমি কিন্তু ন্যারেশন বা গদ্যে ব্যবহার করিনি।

অর্ণব: না, কবিতার ক্ষেত্রেই।

তন্ময়: হ্যাঁ, কবিতাতে ব্যবহার করেছিলাম। আমি মনে করি কবিতায় যদি এখনও ব্যবহার করি সেটা অপাঙক্তেয় হবে না, বরং বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যকেই সূচিত করবে। আমি বাংলাভাষাকে কখনোই বাংলা আর বাংলাদেশি ভাষায় ভাগ করি না, বাংলাদেশি বলে কোনো ভাষা হয় না বলেই আমি বিশ্বাস করি এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা ইত্যাদি কারণে এখনও যদি সেই ভাষা লেখায় আসে, আমি সেটা ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করব না। ওই জাতীয় কবিতায় কেন এসেছিল ওই জাতীয় শব্দ? কারণ কবিতাগুলোর প্রচ্ছন্ন চেতনায় ওপার বাংলা ছিল, ফলে ওপার বাংলার সমসাময়িক শব্দব্যবহারও কবিতায় অবচেতন থেকেই উঠে এসেছিল। কাজেই সেটা তৎকালীন সময় বা কবিতার যে ভাব তার প্রেক্ষিত হিসাবেই আমি ওই শব্দগুলোকে ভাবি এবং এখনও যদি সেই ভাব বা প্রেক্ষিত আসে আমি সেটা ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করব না।

অর্ণব: বেশ, আমরা যদি আরও কিছু পরবর্তী বইয়ের দিকে একটু উঁকি মারি তবে দেখতে পাই 'দিনান্তের সৎকারগুচ্ছ অথবা আত্মহনন-পদ্ধতি' বইটিকে। এটি প্রকাশ পায় ২০২১ সালে, সম্ভবত ২০২২-এ পাঠক বইটি বইমেলা থেকে সংগ্রহ করেছিল এবং পড়তে শুরু করেছিল। আমার মনে হয়, তোমার ব্যক্তিগত লেখালেখি চর্চায় এই বইটি একেবারে একটা ভিন্ন ধর্মের গদ্যকে ক্যারি করে।

'আত্মানং বিদ্ধি'-এর গদ্য অনেক বেশি আত্মকথন, সেখানে গদ্যের সহজতা তার ডিকশনের যে ধর্ম সেটা অনেক বেশি সহজ, যেন গল্প বলার মতো করেই খানিকটা এগিয়ে গেছে। সেখানে অনেক ডায়ালগ এসেছে, মানে যা দেখছ তুমি সেই দেখাটাই একেবারে



ডায়রির মতো করে অনেকটা উঠে এসেছে, আমি এই জায়গাটা বলতে চাইছি। এবার আমরা 'দিনান্তের সৎকারগুচ্ছ' বইটির দিকে তাকাই। আমি তার কয়েকটি উদাহরণ দিই, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হতে পারে সাধারণ পাঠকের কাছেও। যেমন 'আমিরাত্রি'— এখানে দুটো শব্দ একসঙ্গে লেখা, আমি আর রাত্রির মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। আবার আমরা যদি দেখি— 'দুগ্ধফেনিল সন্ধিপ্রস্তাব'। 'দুগ্ধফেনিল' শব্দটি একসঙ্গে লেখা এবং যার পাশে একটা শব্দবন্ধ 'সন্ধিপ্রস্তাব' যা সব সময় একসঙ্গে হতেই পারে কিন্তু এইধরনের যে শব্দবন্ধ— আমি আরও দু-তিনটে উদাহরণ দিলে হয়ত স্পষ্ট হবে। যেমন ধরা যাক, এই যে 'আমিরাত্রি' শব্দটা, এই শব্দটায় বারংবার করে লেখাটার মধ্যে রিপিট হয়, এবং তা একটা অন্য সত্তাকে বহন করে। এবং একেবারে লেখার শেষে দেখা যায়, একদম শেষের পাতায়, যে 'আ' এবং 'মি'-এর একটা অন্তরায় তৈরি করা এবং একটা অন্তরও তৈরি করা এবং সেটা এইভাবে লেখা হয় যে— 'আ' এবং 'মি' এই বীজাক্ষরের ভেতরেও ঢুকে পড়ল কামনা। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা জানতে চাই যে, এই বইয়ের লেখার সময়কার যে জার্নি এবং এই ধরনের শব্দকে লেখার যে অসম্ভব প্রয়াস, যা পরবর্তী বা পূর্ববর্তী বইতে চট করে দেখা যায় না এবং তোমার কথা অনুযায়ী যে তুমি তোমার এই সত্তাকে এই লিখনশৈলীকে অনেকটা পরিমাণে ঠেলে দিয়েছ ওই 'দিনান্তের সৎকারগুচ্ছ'-তে, আমারও ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন, এই সময়ে দাঁড়িয়ে তুমি সেই লেখাটির কাছে কতখানি পৌঁছাতে পারো অথবা কতখানি সেই লেখাটিকে ছেড়েও এসেছ। অর্থাৎ ওই জার্নিটাকে কতটা তুমি এখন বহন করো, এই জায়গাটাকে আমি একটু জানতে চাই। আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন এই সঙ্গে আমি জানতে চাইছি, এই বইয়ের লেখাটিকে যদি আমরা দেখি, দেখা যায় বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্যারাতে বইটা তৈরি করা হয়েছে। কোনোটা ৭ লাইন ৮ লাইন আবার কোনটা ৬ লাইন তারপর আবার একটা প্যারা, এইটাকে রাখার কি আলাদা কোনো উদ্দেশ্য ছিল?

তন্ময়: প্রথম কথা, দুগ্ধফেনিল শব্দটা কমন এবং সন্ধিপ্রস্তাব শব্দটাও কমন, কাজেই এইটাকে শব্দবন্ধ হিসাবে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছি না। তবে এই বইয়েই যে গদ্যভাষা তা আমার আগের কোনো বইয়েও নেই এবং

পরের কোনো বইয়েই নেই। কিন্তু তার মানে যে, কোনো গদ্যেই নেই— তা নয়, তার আগের মোটামুটি ২০১৬-২০২০ পর্যন্ত পর্যন্ত লেখা একাধিক গদ্যে এই গদ্যভাষাটা আছে, সেগুলো অগ্রন্থিত, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। তারই একটা চূড়ান্ত নিদর্শন হতে পারে এই বইটা। দ্বিতীয়ত, আমি যখন লেখা শুরু করেছিলাম, আমি খুব আশা নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম যে একটা উপন্যাস লিখব।

অর্ণব: আচ্ছা, খুব ইন্টারেস্টিং!

তন্ময়: হ্যাঁ, এবং উপন্যাসে যেটা হয় যে, গড়পড়তা কাহিনিধর্মিতা বা ন্যারেশনের থেকে আলাদা চরিত্রের কিছু লিখব, সেই জন্য বইটার মধ্যে যাই হোক হালকা একটা কাহিনিসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। লিখতে-লিখতে বুঝলাম যে এত ঘন লেখা হয় যাচ্ছে যে একটা বাক্যের মধ্যেই হয়তো দশটা বাক্য লিখে ফেলছি।একটা প্যারার মধ্যেই হয়তো পাঁচ পাতার কথা লেখা হয়ে যাচ্ছে...

অর্ণব: আমি একটু পাঠকের সুবিধার জন্য, যারা এটা পড়বে তাদের জন্য বলছি 'আমিতুষ্টি', 'আমিরাত্রি', এবং আরও আরও অনেকগুলো শব্দ আছে যেমন, 'আমিপৌষে' এবং দেখা যায় আরেকটি শব্দ 'আমিকৃষ্ণের', আমি শব্দগুলো যেভাবে লেখা আছে উপসর্গযুক্ত হিসাবে সেভাবেই পড়লাম আর কি, 'আমিস্পর্শ' যেমন আরেকটি শব্দ হয়তো। অনেকদিন আগের বই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কিছু মনে পড়ে, একটি লাইন আমি এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে চাই, 'মুহূর্তের আমিটিকে নিয়ে এই আদেখলাপনাও আসলে দুর্বলতারই নামান্তর'। এখানে যদি 'আমি'-সত্তাটাকে একটু...

তন্ময়: এখানে 'আমি' শব্দটাকে ব্যক্তি-আমি হিসাবে ব্যবহার না করে ব্যবহার করেছি তৃতীয়জন হিসাবে, মানে যেমন রাম-শ্যাম, তেমন আমি...

অর্ণব: অর্থাৎ 'আমি' যে-কেউ হতে পারি।

তন্ময়: হ্যাঁ, আমি যে কেউ হতে পারে এবং আমির সঙ্গে যুগ্মভাবে যেগুলো হয়েছে, সেটা আমি-র যে ক্ষুদ্রার্থ এবং প্রত্যক্ষ অর্থ তা উত্তীর্ণ হয়ে একটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা। এই বইয়ে যদ্দূর মনে পড়ছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস থেকে নানান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনার রেফারেন্স রয়েছে। সেই সমস্তটার কারণে, সেই সামগ্রিকতার কারণেই আমার মনে হয়েছে, লেখাটি হয়তো পাঁচ হাজার শব্দের লেখা, একটা দু-



ফর্মার বই কিন্তু লেখাটি এত ঘন হয়ে উঠেছে, যে তার মধ্যে বিভিন্ন আলোছায়া খেলা করার অবকাশ রয়ে গেছে।

অর্ণব: একদমই কোথাও কি তোমার এই লেখাটা লিখতে লিখতে মনে হয়েছে যে 'আমি' সত্তাটা আমি স্বয়ং একটি ব্রহ্মাণ্ড হতে পারি অথবা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই এই আমি সত্তাটা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে?

তন্ময়: সে তো একশোবার মনে হয় 'অহম ব্রহ্মাস্মি'। পুরো বইটাই আমার মনে হয় আদান-প্রদানের কথা বলা, ব্যক্তির সঙ্গে গভীর বিশ্বের আদান প্রদান করতে করতে এগিয়েছে।

অর্ণব: আমরা এবার এই বইগুলো ছেড়ে যদি একটু অন্যধরনের বই নিয়ে কিছু কথা বলে নিতে পারি, মূলত গদ্যের বই নিয়েই প্রথম দিকটা একটু আলোচনা করতে চাইছি। একটি বিশেষ বই, সাম্প্রতিক সময়ে বেরোনো, যদি সালটা আমারা খেয়াল করি খুব সম্ভবত 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' বইটি ২০২৫ এর বইমেলায় প্রকাশ পায়। 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' বইটির কথা আমি বলছি কারণ এই বইটি কয়েকজন এমন মানুষের সাক্ষাৎকার যে মানুষগুলো ইতিহাসধর্মী কাজ করে গেছেন, সেই সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়ার যে ইচ্ছে বা তাগিদ সেটা কি তোমার কাজের যে ব্যাপ্তি তা থেকেই তৈরি ? নাকি এই কাজটি আলাদাভাবে আর্কাইভ হিসেবে রাখারও একটা তাগিদ থেকে তৈরি?

তন্ময়: প্রাথমিকভাবে 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' বই হিসেবে ২০২৫-এ বেরিয়েছে কিন্তু কাজটা ২০২৩-২৪-এ করা। আমি গত ১০-১২ বছরের বিভিন্ন কাজ, হয়তো সব বই হয়নি, বিভিন্ন প্রবন্ধ বা নিবন্ধ আকারে বেশ কিছু লেখা হয়েছে বা হয়তো কিছুই হয়নি আমি শুধু পড়েছি, পড়ে বিভিন্ন বিষয়ে সামান্য কিছু কৌতূহল ও সামান্য বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে, সেই বোঝাপড়ার জায়গা থেকেই বুঝতে চাইছিলাম যে, আমি যে বিষয়টিতে স্বল্প জানি আর যে মানুষটি আমার বিপরীতে কোনো একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন বা কাজ করেছেন তার থেকে বিষয়টি বুঝে নিতে চাওয়ার চেষ্টা করা দরকার। এইটা একটা কারণ এবং তার থেকে বড়ো কথা, আমি নিজেকে প্রাথমিকভাবে কবিতার জগতের লোক বলে মনে করি এবং আমি ইতিহাস ও নন-ফিকশনও চর্চা করি, সেই সূত্রে আমার উলটো দিকের লোকটির সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছি।

অর্ণব : সব মিলিয়ে বইটিতে সম্ভবত ১৫ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই কমল চৌধুরী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তুহিন মুখোপাধ্যায়, কানাইপদ রায় এঁদের মতন মানুষদের যাঁরা কোনো-না-কোনো ইতিহাসধর্মী দীর্ঘ কাজ করে গেছেন, প্রায় সবাই তাই কম-বেশি। আবার শুভদীপ চক্রবর্তী, অলোক সরকার আমাদের সমসাময়িক লেখক। সেইরকম যাঁরা এটকু অন্য ধরনের কাজ করছেন, বিভিন্ন জেলাভিত্তিক স্তরে ইতিহাসকে খুঁড়ে আনার চেষ্টা করছেন। কোথাও-না-কোথাও তাত্ত্বিকভাবে সেই কাজগুলো তোমার কাজের সঙ্গে মিলেছে বলেই তুমি এরকম একটি সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছ।

তন্ময়: হ্যাঁ, আমার মনে হয়েছিল যে, সাধারণত যারা কবিতার জগত বা এক অর্থে গল্প, কবিতা, উপন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন, তাঁদের সংখ্যাগুরু অংশ এই জাতীয় বিষয় সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল নন, আর আমি দুটোকেই খুব কাছ থেকে দেখেছি। একটা আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা, আর একটা হচ্ছে কবিতা। এই দুটোর মধ্যে সহজে মুখ-দেখাদেখি হবার জায়গা তৈরি হয় না না, হয়তো মানুষের আগ্রহের অভাবে কারণে একপক্ষ আরেকপক্ষের প্রতি কৌতূহল দেখায় না। এই জায়গার থেকে আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি ব্রিজ হতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের মতো যারা অল্পবিস্তর লেখালিসাহিত্যচর্চা করি, তাদের কাছেও ওই মানুষগুলোর কাজ পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে এবং সেটাও প্রয়োজন। ওঁদের কাজ শুধু একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির সীমাবদ্ধ রইল— সেটা কোনো কাজের কথা নয়, এবং তার থেকেও বড়ো কথা, আমরা দিনের শেষে গল্পকার বা কবি বা উপন্যাসিকদের গুরুগম্ভীর সাক্ষাৎকার নিই, কিন্তু যাঁরা আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন এবং বিভিন্ন অজানা তথ্য তুলে আনেন, তাঁদের যে কাজের ব্যাকগ্রাউন্ড বা কাজের ভাবনাচিন্তা সেগুলো ওয়েল ডকুমেন্টেড হয় না। একটা সংরক্ষণের চিন্তার থেকেও কাজটা করা, তাঁদের ভাবনাচিন্তাটা যাতে কোথাও একটা মুদ্রিত থাকে, সেই দুটো ভাবনার থেকেই এই সিরিজটা করেছি।

অর্ণব: বইটার নাম 'ঈর্ষাক্ষাৎকার-১', ফলে আমরা আশা করতেই পারি যে এরকম আরও কয়েকটি সংকলন 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' এরপর বেরোবে।

তন্ময়: এখানে আমি আশা ভঙ্গ করব, কারণ যখন কাজটা করছিলাম আমার



ইচ্ছা ছিল চার পনেরোং ষাটটা কাজ করার এবং তার পরিকল্পনাও ছিল।

অর্ণব: তো কাজটা এই মুহূর্তে কী দাঁড়িয়ে আছে?

তন্ময়: এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারব না, পরবর্তী খণ্ডে কাদের কাদের নেব সেই পরিকল্পনাও করে রেখেছিলাম কিন্তু সার্বিকভাবে কাজটিকে আমার মাথার থেকে বাতিলের খাতায়। তার কারণ প্রথমত, খুব স্পষ্টভাবে বইটি বাণিজ্যসফল হয়নি, যে-কোনো বিষয় যখন পণ্য হিসেবে মার্কেটে আসে, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিক্রি হয় সেটা প্রকাশকেরও ভালো লাগে আর আমারও ভালো লাগে, পরবর্তী কাজ করার উৎসাহ জাগে ইত্যাদি ইত্যাদি... বইটি আমি যা আশা করেছিলাম, ততটা বিক্রি হয়নি। ফলে আবার পুরো পরিশ্রম করে আর একটা কাজ করলে দুর্দান্ত আর্কাইভ-এর কাজ হবে, কিন্তু মানুষজন যদি না-পড়ে, তাহলে সেই পরিশ্রমটা ভস্মে ঘি ঢালা হবে। এখানে একটা প্রশ্ন আসে 'বই বিক্রি হবে বলেই কাজ করা, নিজের তাগিদ থেকে না?' অবশ্যই নিজের তাগিদ থেকে সেক্ষেত্রে আমি প্রেফার করব অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে করতে, কারণ আজকের দিনে সাক্ষাৎকার একেই বোরিং বিষয়, খুব কম মানুষ ধৈর্য ধরে সাক্ষাৎকারের বই পড়ে, সেখান থেকে লিখিত সাক্ষাৎকার-এর বদলে যদি অডিও ভিজ্যুয়াল কথোপকথন বা পডকাস্ট-এর ফরম্যাটে হয় সেটা আর্কাইভ এর দিক থেকেও জরুরি এবং অপেক্ষাকৃত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবার একটা পোটেনশিয়াল থাকবে। সেই জায়গা থেকেই আমার মনে হয়েছে, আমি যে-কাজটা করেছি, আর্কাইভের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, কিন্তু এটা বই হিসাবে করে গেলাম ধারাবাহিকভাবে, যেখানে একটা পণ্য মার্কেটে বিক্রির জন্য ল্যান্ড করল কিন্তু বিক্রি হল না। প্রকাশক আমাকে বলেই রেখেছেন ধারাবাহিকভাবে করতে, কিন্তু আমার চিন্তা, এটা যেন ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে যদি কাজটা করিও, ফর্মটা অন্যভাবে করার চেষ্টা করব।

অর্ণব: তোমার সাম্প্রতিক বই 'গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ'। তার আগে বলব— কিছুটা তুমি আগেই এই বিষয়ে বলেছ তাও, তুমি একজন কবি, কিন্তু

তোমার মনে হল— যাঁরা গবেষণার কাজ করেছেন বা যাঁরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদেরকে সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত— এই তাগিদটা কেন? বেঁচে থাকা বহু গদ্যকার বা ঔপন্যাসিকদের সাক্ষাৎকার না-নিয়ে কেন এই ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়াটা তোমার কাছে জরুরি বলে বলে মনে হল?

তন্ময়: প্রথম কথা, বেঁচে থাকা কবিদের মুদ্রিত সাক্ষাৎকার প্রায়শই নেওয়া হয় এবং দেখাও যায়। যদিও অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে জীবিত অগ্রজ কবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আমার বহুদিনের ইচ্ছা, উপযুক্ত প্লাটফর্ম পাচ্ছি না বলে নেওয়া হচ্ছে না। সেই পরিকল্পনা আমার আছে এবং সেই বিষয়ে ভেতর ভেতর আমার প্রস্তুতিও আছে, কাদের নিতে চাইছি সেই ভাবনাচিন্তাও আছে, তবে সেটা আমি লিখিত মাধ্যমে নিতে চাই না কারণ লিখিত মাধ্যমে সেসব বহু জায়গায় রয়েছে।

অর্ণব: এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এ কথাটা উঠে আসছে বারবার যে, মাধ্যমটা খুব ম্যাটার করছে।

তন্ময়: কথোপকথন-নির্ভর বিষয়ের ক্ষেত্রে মাধ্যম নিয়ে ভাবা জরুরি তো বটেই!

অর্ণব: তার মানে কি আমরা বলতে পারি, তোমার যে চর্চাগুলো তুমি ব্যক্তিগতভাবে করো, সেই চর্চাগুলোর মধ্যে সাক্ষাৎকারই এমন একটা বিষয়, যা লিখিত ফরম্যাটে আসার থেকেও অডিও ভিস্যুয়াল ফরম্যাটে আসার ক্ষেত্রে অনেকবেশি খাপ খেয়ে যায়, নাকি তুমি মনে করো যে আরও কোনো তোমার চর্চার ফর্ম আছে বা কাজ আছে যেটাকে তুমি অডিও ভিস্যুয়াল ফর্মে আনতে চাও, যা তোমার হয়তো এক সময়ে ছাপার অক্ষরে করার ইচ্ছে ছিল বা আজ থেকে দু-তিন বছর আগেও, যা এখনও হয়ে ওঠেনি?

তন্ময়: সাক্ষাৎকার বা কথোপকথনের ক্ষেত্রে, ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে যেখানে প্রযুক্তি এখন ইত্যাদি আমাকে সাহায্য করছে, সেখানে ছোটোখাটো মাধ্যমে আমরা যদি অডিও ভিস্যুয়াল ডকুমেন্টেশন রাখি তবে সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুব উপকারী হতে পারে। ইউটিউবে যদি একটা অডিও ভিস্যুয়াল ফরম্যাটে কোনো গভীর সাক্ষাৎকার থাকে, সেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর বাদেও যে-কেউ দেখতে পাবে।



অর্ণব: আমার কিন্তু সেই কাজটাকে বইয়ের আকারে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি মনে হয়, কেননা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, ধরো আজ থেকে পাঁচ দশক পরের প্রজন্ম, এদের কাছে কি ইউটিউব বলেই অ্যাপ্লিকেশনটি থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? এটা কি অন্য কোনো এপ্লিকেশন দ্বারা রিপ্লেসড হতে পারে না?

তন্ময়: হ্যাঁ, একশো বার রিপ্লেসড হতে পারে।

অর্ণব: ঠিক সেই ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়, একটি বই কি অনেক বেশি সেফ জোন নয়?

তন্ময়: টিকে থাকার ক্ষেত্রে সেফ জোন কিন্তু এটাও ঠিক যে তখন আর কোনো বিকল্প ছিল না এবং আমাদের কাছে অন্য একটা বিকল্প মধ্যম আছে।

অর্ণব: তাহলে কথপোকথনের ক্ষেত্রে তোমার কাছে এখন সবচেয়ে মেজর ফর্ম অডিও ভিsyuয়াল?

তন্ময়: হ্যাঁ, আমি অডিও ভিস্যুয়ালে প্রাধান্য দিই, তার কারণ আমার কাজ করার পেছনে আমার নিজের তৃপ্তি একটা বড়ো কথা সেটা যদি প্রথম ধাপ হয়, দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, আরও পঞ্চাশটা মানুষের কাছে জিনিসটা পৌছে দেওয়া। আমার বইয়ের ক্ষেত্রে যদি সেটা তিরিশটা মানুষের কাছে পৌছয় আর অডিও ভিস্যুয়ালের ক্ষেত্রে যদি একশোটা মানুষের কাছে পৌছে যায়, তবে আমি সেই কথোপকথনের ক্ষেত্রে আমি সেই একশোটা মানুষের কাছে পৌছে যাওয়ার পথটাই বেছে নেব।

অর্ণব: আচ্ছা, এই 'গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ' বইটির প্রোডাকশন, বইটির সাজানো, ফরম্যাট সমস্ত দিকটা খেয়াল করলে দেখা যায়, একটি দীর্ঘ ম্যাপ বইয়ের ভেতরে পাঞ্চ করা এবং যে-ধরনের পাতায় বইটিকে ছাপানো হয়েছে সেটি বাংলা ভাষার বইয়ের ক্ষেত্রে চট করে খুব একটা দেখতে পাই না, এখানে প্রকাশকদের ফিনানসিয়াল জায়গার মতো অনেক প্যারামিটার চলে আসে এবং সে যত্নটা দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে বইটির ভেতর কন্টেন্ট এর আগেই যেটি নজর কাড়ে সেটি হল বইটির বাইন্ডিং, অক্ষরবিন্যাস, ভেতরে সুন্দরভাবে সাজানো ছবি, অলংকরণ, প্রচ্ছদ। নানানভাবে যদি দেখি, তোমার সামগ্রিক যে বই লেখালিখি সেই দিক থেকে এই বইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার। এই বইটিকে এইভাবে সুন্দর করে সাজানোর পরিকল্পনা তোমার বা

মাস্তুল-এর প্রকাশক, যেখান থেকে বইটি বেরিয়েছে— এই যৌথ চর্চাটা কীভাবে কাজ করেছিল?

তন্ময়: প্রথম কথা বইটার গঠনগত পরিকল্পনা বা ভেতরের অঙ্গসজ্জার পরিকল্পনা আমার এবং সেটা এক্সিকিউশনের কৃতিত্ব পুরোটাই আকাশের। আমার একটা গুণ বা দোষ যাই হোক, যে-কোনো কাজ যখন আমি বই হিসাবে করা শুরু করি তখন ভেতরে ভেতরে আমি পাতার লে-আউট থেকে শুরু করে কীভাবে সাজানো হবে সেটা পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় থেকেই মাথায় সাজিয়ে নিতে পারি। কাজেই বইটার যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুই উল্লেখ করলি, সেইগুলো আমার পরিকল্পনায় ধাপে ধাপে চলেছিল। বইটার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, আমি যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং আকাশ সাহায্য করেছিল, প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট, ছবি, মানচিত্র, প্রতিচ্ছবি প্রত্যেকটা রঙিন রাখা। আমাদের বাংলাবাজারে যে-কোনো জিনিস রঙিন ছাপানোটা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। আমরা মনে করেছিলাম যে, ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে একটা বই বার করছি, তাতে হয়তো কস্টিং বেশি হবে কিন্তু যদি রঙিন না ছাপি তাহলে কিন্তু জিনিসটা অত খেলা করবে না। সেটার দাম বেশি হবে, আর সে কারণেই আনফরচুনেটলি আমার যে নতুন বইটা (ঘাট, গির্জা, বন্দর ও অন্যান্য বিস্মৃতি) আসছে সেটা রঙিন করতে পারলাম না, পুরোটা সাদাকালোই করতে হয়েছে।

অর্ণব: সেটা কি প্রকাশকের দায়বদ্ধতা থেকে?

তন্ময়: প্রকাশকের পয়েন্ট ছিল যে, বইটা যদি রঙিন করা হয় তবে কস্টিং অস্বাভাবিক বেড়ে যাবে এবং তাতে সম্ভাব্য কাস্টমার অনেক কমে যাবে, যে লজিকটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আমার মনে হয় বইয়ের কাঠামো বা গঠনের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, যে-যে বিষয় নিয়ে লেখা হচ্ছে তার প্রত্যেকটার অরিজিনাল ডকুমেন্টের রেফারেন্স তার সঙ্গে দেওয়া। তাছাড়া গঠনগতভাবে পুরোটাই আমাদের পরিকল্পনার ফসল যে বইটা কীভাবে হবে, এবং আরও একটি বিষয় আমার নতুন যে বইটি আসছে ওইটি একটি ২০৮ পাতার বই, ওটার পেজ লেআউট বা পেজ সেটাপ যাই বলা হয় সেটা সম্পূর্ণটা আমি নিজের হাতে করেছি, কোনো জিনিস নিজের হাতে যদি করে ফেলা যায় বই নির্মাণের ক্ষেত্রে, তার আনন্দই



আলাদা। বদলে আমি যদি কোনো প্রফেশনাল কাউকে দিই, তিনি নিজের মতন করে বসাবেন, তিনি সেই প্রাসঙ্গিকতাটা নাও বুঝতে পারেন। এখানে উপায় হয় পাশে বসে বসে করানো, নয় নিজে করে নাও। এখানে নিজে করে নেওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি যেটা বলছিলাম— আমি ভেতরে ভেতরে কল্পনা করি যে কীভাবে একটা বইকে এক্সিকিউট করব, নিজের হাতে করে আমি বুঝতে পেরেছি যেটা চেয়েছিলাম ঠিক সেটাই করতে পেরেছি এবং সেটা প্রকাশকের অনুমোদনও লাভ করেছে, জিনিসটা দেখার পর প্রকাশক খুশিও হয়েছে। এইটা আমার মনে হয় খুব বড়ো একটা বিষয়। যদি নিজে শিখে ফেলা যায় এবং নিজের মতো করে বইটা তৈরি করা যায়, যার জন্য অবশ্যই প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে— একটা বই নির্মাণ সম্পর্কে যতসম্ভব ধারণাটা থাকা দরকার, সেটা না থাকলে হয় না। শুধু আমি লিখলাম আর প্রকাশকের হাতে ছেড়ে দিলাম এটা খুবই যৌক্তিক কাজ, অনেকেই সেটা করেন, এসব জানাটা বাধ্যতামূলক নয়। আমার ক্ষেত্রে জানাবোঝাটা একটা বেনিফিট হিসাবে কাজ করে।

অর্ণব: এই সমস্ত বইকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নটি গড়ে ওঠে যেটা 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে' থেকে একেবারে তোমার সাম্প্রতিক যে বইটি প্রকাশ হতে চলেছে এই বছরের (২০২৫) শেষের দিকে, সেই বইটি— এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে তোমাকে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এত খেটেখুটে বই করার পরও সেখান থেকে মানুষ টুকে একটি লেখা লিখে দিতে পারে, সেটা তো ঘটেই চলেছে। এই বাধাগুলো পেরিয়ে তোমার কোথাও কি নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়?

তন্ময়: খুব ভালো প্রশ্ন, প্রথম কথা আমি এ জাতীয় কাজ করতে ক্লান্ত বোধ করি না, কেউ ধর কোনো পত্রিকার থেকে বা কিছুর থেকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে লিখতে বলার জন্য ফরমাশ দিল, যেটা আমার স্বতস্ফূর্ত লেখা না, কিন্তু লিখতে হবে— তাতে বেশ কিছু সময় ক্লান্ত বোধ করি। তাছাড়া বইয়ের কাজগুলো বা অধিকাংশ কাজেরই প্রাথমিক তাগিদ আমার নিজের কৌতূহল। সেটা আমার নিজের খোঁজ। কাজেই সেটা যখনই প্রাথমিক উপাদান হয়ে দাঁড়ায় তখন সেখানে ক্লান্তি থাকে না। আমার নিজের কাজটা করতে ইচ্ছা করছে

বিষয়টি নিয়ে খুব উত্তেজনা জাগছে, ফলে এমন বিষয় নিয়ে কাজ করব। হয়তো এমন বিষয় নিয়ে কাজ করছি যেখানে আমি পাঁচ পারসেন্ট তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম, সেটাকে খোঁড়াখুড়ি এবং বিশ্লেষণ করতে করতে ৮০ পারসেন্টে নিয়ে যেতে পেরেছি, এই জার্নিটাকে আমি ভীষণভাবে ইনজয় করি। দ্বিতীয় কথা, ২০১৫-তে 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে'-র কাজ শুরু হয়েছিল। বাধা, অপমান ইত্যাদি তো সহ্য করতেই হয়েছে। আমার প্রথম শিক্ষাই হয়ে গিয়েছিল ২০১৫ সালে, যখন শুনতে হয়, 'ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছেলে ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে এসেছ কেন?' বিভিন্ন জায়গায় এরকম হয়েছে, একবার একটা পুথি খুঁজতে এক আশ্রমে গিয়েছিলাম, সেখানে মোহান্তের মুখে শুনতে হয়েছে 'আর একটা যদি কথা বলো পুঁতে রেখে দেব এখানে লোক ডেকে, চলে যাও এক্ষুনি'— সেই মারমুখী হয়ে ওঠা লোকগুলোকেও দেখেছি বা দেখতে হয়েছে। কলকাতার বেশ কিছু রেপুটেটেড জায়গায়, 'আজ হবে না কাল এসো', 'অন্য কোনোদিন এসো', 'আজকে আমাদের ওই বিভাগটা বন্ধ আছে'— এরম করে একটা ডকুমেন্ট জোগাড় করার জন্য তিন-চারদিন ঘুরতে হয়— এমন হয়েছে। দিল্লিতে ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া, তাদের থেকে ডকুমেন্ট আনাব, টাকা পেমেন্ট করব, কিন্তু তাদের নিয়ম হচ্ছে শুধুমাত্র চেক-এর মারফত টাকা পাঠানো যাবে। আকজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনলাইনের কোনো ব্যবস্থা নেই! সেটা এই আগস্ট-সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এই বছরই হয়েছে, পোস্ট অফিসের দীর্ঘ সফটওয়্যার বদল হওয়ায় প্রায় ১৫-২০ দিন ঝুলে গেছে কুরিয়ার বা পাঠানোর পরিষেবা। নতুন বইটার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় বা জায়গা— আগে যেখানে নিদর্শন ছিল এখন সেখানে বেসরকারি জায়গা বা কারখানা হয়ে গেছে, অর্থাৎ সেসব এখন প্রাইভেট প্রপার্টি, ঢুকতে দেয় না। আমাদের কামারহাটির একটা জায়গায় ঢুকতে গেছি, আমাকে বলা হয়েছে 'না, ঢুকতে দেওয়া হবে না, মদন মিত্রের থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে।' তারপর কোনো একটা জায়গায় গেছি, 'না, ঢুকতে দেওয়া হবে না, হেড অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে', তারপর সেই হেড অফিসে যাওয়া, চিঠি লিখে অ্যাপ্লিকেশন করা, বারংবার ফোন করে



ফলোআপ করা আর সর্বশেষে সেটা রিজেক্ট হওয়া— কোথাও আবার গৃহীত হওয়া— এই ধরনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লেগেই থাকে। আর বই হয়ে যাবার পরে যে প্লেগারিজম, সেটা তো হয়ই, একজন একটি বই লিখেছিলেন, 'গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ' বেরোনোর পরে, গঙ্গা-তীরবর্তী একটি নির্দিষ্ট নিয়ে, বইটি তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছেন আর ভেতরে আমার একটা প্যারা লাইন বাই লাইন হুবহু টুকে দিয়েছেন। বেলঘরিয়ার বইটা নিয়ে তো ভুরি ভুরি অভিজ্ঞতা হয়েছে, এমনকি ভাইফোঁটার বইটা (না যাইয়ো যমের দুয়ার) নিয়ে এবছরই একটি খুব রেপুটেটেড সংস্থার এক বিভাগে একজন একটি ফিচার বা প্রবন্ধ লিখলেন, বইয়ের নাম উল্লেখ করেননি এবং আমার বইয়ের যে মূল বিষয়— বিভিন্ন মন্ত্রের বৈচিত্র্য— সেগুলো ধরে ধরে কোট করে করে পুরো তুলে দিয়েছেন। এছাড়া আমার কখনো কখনো এমনটাও মনে হয় যে, খুব খেটেখুটে একটা বিষয় নিয়ে লিখলাম তারপর সেটা আরও দু-তিন জায়গায় কপি হয়ে বেরিয়ে এল...

অর্ণব: হ্যাঁ, আমার মনে হয় বাংলা ভাষায় এই জিনিসটা এখন আর সহজ হয়ে গেছে।

তন্ময়: কোথাও প্রপার তথ্যসূত্র দিয়ে বইয়ের তথ্য নেওয়া সেটাকে আমি অপরাধ মনে করি না, সেটা একাডেমিক প্র্যাকটিসের একটা অঙ্গ। কিন্তু সেখানে যদি প্রপার ক্রেডিট না দেওয়া হয় সেটাকে আমি অন্যায় বলে মনে করি। এখান থেকে মাঝে মধ্যে ফাস্ট্রেশন লাগে যে, একটা বিষয় আমি প্রচুর খেটেখুটে বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করলাম সেটা বড়োজোর খুব বেশি হলে আমি অর্থাৎ লেখালেখির যে পরিসর থেকে উঠে এসেছি— আমি তো কখনো চার হাজার, পাঁচ হাজার বই বিক্রির কল্পনা করতে পারি না, আমার কাছে ৪০০-৫০০ বই বিক্রি মানে স্বর্গ পেয়ে যাওয়া, সেই জায়গার থেকে দাঁড়িয়ে যদি দেখি যে খুব কম পরিশ্রমে তথ্যসূত্র উল্লেখ না করে অন্য কিছু না করে শুধুমাত্র একটা রিল বানিয়ে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, ফলোয়ারটা বিষয় না, বিষয় হচ্ছে আমিও একটা পরিশ্রম করছি... বই আকারে বার করছি কেন? কাজ আমি করছি আমার আনন্দে, কিন্তু বই আকারে যখন বের করছি, সেটা তো মানুষের কাছে পৌঁছে যাবার জন্য— চাইছি মানুষ পড়ুক। সেটা যখন অন্য কোনো মাধ্যমের দ্বারা

মানুষের কাছে অতি দ্রুত পোঁছে যায় এবং বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছে যায়, তখন মাঝেমধ্যে হতাশ লাগে কিন্তু তারপরও মনে করি যে, প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা কাজ থাকে, আমার কাজ বা আমার মাধ্যম এটাই— লেখা।

অর্ণব: আমাদের সব কবিতা উত্তীর্ণ হয় না লেখার পর, তবুও আমরা ভেতরের তাগিদ থেকে লিখি, কখনো প্রয়োজনেও লিখি আবার কখনো সম্পাদকের তাগিদ থেকেও, এবং 'আমরা' বলতে আমি সার্বিক অর্থেই বলতে চাইছি, তোমাকেই নির্দিষ্টভাবে বলা তো নয়... তো এরকম কি কখনো কোনো কাজ করতে হয়েছে, যার আধারটা তোমার কাছে খুব একটা ভালো করে ধরা নেই কিন্তু কোনো একটা এমন সূত্র বা তথ্য তোমার কাছে এসেছে যে, তথ্যটা হয়তো খুব সামান্য, সামগ্রিকতার হিসাবে হয়তো পাঁচ বা সাত পার্সেন্ট জানো, এবার সেইটা নিয়ে যখন তুমি পড়াশুনো শুরু করলে এবং তোমার মতন করে তথ্য সংগ্রহ করলে তখন কাজটা ক্রমশ পালটে গেল এবং অভিমুখটাই বদল হয়ে গেল এবং দেখা গেল তা এমন একটি অভিমুখে নিয়ে গেল যা তোমার প্রথমে শুরুর যে ইচ্ছে বা যে ধরনের একটা খোঁজ ছিল সেই খোঁজ থেকে অনেক দূরের খুব সামান্য একটা সূতার হয়তো সংযোগ রয়েছে।

তন্ময়: হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সৌভাগ্য হয়তো যে, আমার প্রথম বইয়েই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, বেলঘরিয়ার ইতিহাসের কাজ করার সময় যখন আমি পূর্বতন ডকুমেন্টগুলো জোগাড় করছিলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ তো এক ফর্মার বেশি কন্টেন্টই এগোবে না। ১৬ পাতা... বড়োজোর ৩০ পাতায় যেতে পারব। কিন্তু প্রথম সংস্করণেই সেটা ১৫০ পাতার বই হয়েছিল। তারপর ৫ বছর পরে তার পরের সংস্করণে প্রায় ৩০০ পাতার কাছাকাছি গিয়েছিল, কাজেই সেখানেই অভিজ্ঞতাটা হয়ে গেছিল যে, লে থাকলে এবং খোঁজ চালিয়ে গেলে মণি-মুক্তো উঠে আসবেই, এবং ২০২১ সালে নতুন সংস্করণ যে বেরিয়েছিল, তারপর গত বইমেলাতে তার তৃতীয় মুদ্রণ যখন হয়েছে তাতেও নতুন কিছু ডকুমেন্ট অ্যাড হয়েছে। আমি একটা জিনিস দেখেছি, যত তুমি খুঁজবে, তত নতুন নতুন উপাদান ও অ্যাঙ্গেল উঠে আসবে। প্রতিনিয়ত পেয়েই চলেছি। 'গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ'-এর তথ্য খুঁজতে



গিয়ে, সম্প্রতি আমি একটা বাংলা মানচিত্র খুঁজে পেয়েছি, বাংলা ভাষায় লেখা মানচিত্র, সেটা এখন যদি ওই বইতে ঢোকাতে যাই তখন ওই বইটা যে ৩৫০- ৪০০ মানুষের কাছে আছে তাদের কাছে আর পৌছাবে না। কাজেই আমি ওটা নতুন বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে রাখছি। ফলে কোনো কাজ করে আমার মনে হয়েছে কাজটা অসম্পূর্ণ, কাজটার আরও গভীরে যাওয়া যেত— এটা হয়েই থাকে। তবু কোন জিনিসটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর ভিত্তি করে কখনো কখনো হাল ছেড়ে দিতে হয়, আবার কখনো নতুন কোনো পথ খুঁজে নিতে হয়, কারণ আমি মুখ্যত যে অংশটা নিয়ে কাজ করি, সেটা আমার অন্তত মনে হয় নেভার এন্ডিং প্রসেস।

অর্ণব: যেমন phd করতে গেলে প্রথম ৬ মাসে একটা ট্রেনিং কোর্সে তাদের শেখানো হয় একটা বই ডেক্সিং কীভাবে তৈরি হবে, তোমার ক্ষেত্রে সেটা কি খুব অর্গানিক?

তন্ময়: আসলে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং তো হয়নি আমার ক্ষেত্রে, আমার ক্ষেত্রে সেটা বই পড়ে-পড়েই হয়েছে।

অর্ণব: আসলে নানা ধরনের ওয়ার্কশপ আমরা দেখি, সেখানে বাংলা বানানবিধি নিয়ে, বাংলা বই কোনটা কোনটা পড়ব? কেন পড়ব? তার প্রকাশ বা এই নানান ধরনের ওয়ার্কশপ আমরা দেখে থাকি, অর্থাৎ যারা নন-একাডেমিক জোন থেকে উঠে আসছে তাদের উপকারের জন্য তাদের একটা জানার জন্য সেই ওয়ার্কশপ গুলো তৈরি হয়। তোমার কি কোথাও গিয়ে মনে হয়, এই ধরনের ওয়ার্কশপ হওয়ার প্রয়োজন আছে?

তন্ময়: প্রথম কথা যারা একাডেমিক কোর্সের মধ্যে দিয়ে আসে তাদের সেটা পড়াশোনার মধ্যেই মিশে থাকে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেই স্কোপ ছিল না, আমার বেলঘরিয়ার ইতিহাস কিংবা ভাইফোঁটার বইটার ক্ষেত্রে দেখা যাবে, বইয়েই শেষে যে বিবলিওগ্রাফি আছে সেগুলোয় শুধু বইয়ের নাম আর লেখকের নাম। তারপর 'গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ'-এ আসতে আসতে ধাপে-ধাপে অন্যান্য পদ্ধতি শিখেছি, শিখে পুরোটা শিকাগো ম্যানুয়াল অনুযায়ী করা, এবং কীভাবে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাতে হয়, কোন প্যাটার্নে সাজাতে হয়, লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনার নাম এইগুলো যে

ধাপে ধাপে করতে হয়, এগুলো সব থেকে-থেকে শেখা। অবশ্যই ওয়ার্কশপগুলো জরুরি, কিন্তু ওয়ার্কশপগুলোর ফাইনাল প্রোডাক্ট কী? কোনো একটা বই হওয়া, আমি সেই বইগুলোর থেকেই শিখছি। আমি যদি এটাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় করতাম তাহলে হয়তো ৫-৭ বছর আগে জানতে পারতাম, আমার ক্ষেত্রে সেটা ৫-৭ বছর লেট হয়েছে, আমি এখনও অনেক কিছু জানি না, প্রতিনিয়ত শিখছি, প্রতিনিয়ত তার জন্য প্রবন্ধের ভাষা বদলাচ্ছে। আর পাঁচ বছর আগে প্রবন্ধের ভাষা এবং এখনের প্রবন্ধের ভাষা এক না, তিন বছর বাদে হয়তো আরও ভাষা বদলাবে, আমার পুরো জার্নিটাই একটা শিখতে শিখতে যাওয়া— কাজেই সেটা চলবে, আর অবশ্যই ওয়ার্কশপ তো অবশ্যই জরুরি, কোনো জিনিস যদি মানুষের জানা না থাকে, আর কোনো অভিজ্ঞ মানুষ জানাচ্ছেন— সেটা জানতে পারা তো অত্যন্ত জরুরি। আমি ওয়ার্কশপ না করলেও বিভিন্ন অধ্যাপকের লেকচার শুনে... নিজেকে প্রস্তুত করার অনেক রকম উপায় আছে। আগে আমি কোনো বইয়ে সাধারণ ভূমিকা লিখে দিতাম, দেশভাগে বা ভাইফোঁটায় বা বেলঘরিয়ায় যেমনটা ছিল, আস্তে আস্তে আমি দেখলাম ইংরেজি বইগুলোর চলন কেমন, প্রত্যেকটা পর্ব বা অধ্যায়কে আলাদা আলাদা করে তাদের সারাংশ ভূমিকায় দিতে হয়, যে আমি কী করছি এবং কেন করছি, সেটা ভূমিকায় তুলে ধরা। তারপর থেকে গঙ্গার বই বা ঈর্ষাক্ষাৎকার বইটায় আমি সেইটা ফলো করছি, মূল বইয়ে তো কন্টেন্ট থাকবেই কিন্তু ভূমিকা থাকছে বইয়ের সারাংশটা।

অর্ণব: 'না যাইও যমের দুয়ার'— এই বইটি মূলত বিভিন্ন ভাইফোঁটার মন্ত্র এবং তারই সংকলন, সঙ্গে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে, পুরাণের নানান প্রসঙ্গ সেখানে উঠে এসেছে, এবং বরুণবাবুর (বরুণকুমার চক্রবর্তী) একটি অসাধারণ ভূমিকা এই বইটিতে রয়েছে। এই বইটি কি পরবর্তীতে বর্ধিত হয়েছে?

তন্ময়: হ্যাঁ, আমার প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণে দুটি মন্ত্র যোগ হয়েছে এবং যদি আবার সংস্করণ করার সুযোগ পাই তবে আরও দু-একটা মন্ত্র এবং বেশ কিছু পুরোনো স্কেচ, উডকাট পেইন্টিং ইত্যাদি ঢোকাতে চৈব।



অর্ণব: তাহলে তোমার কথার সূত্র ধরেই বলা যায় যে, তোমার প্রায় সব কাজই যা দেখলে আদপে মনে হয় শেষ কিন্তু তা নেভার এন্ডিং।

তন্ময়: একদমই তাই। আসলে পরবর্তী সংস্করণ মানে কী? পাতা বাড়বে... অনেক টেকনিক্যাল বিষয়ও মাথায় রাখতে হয়, একটা বই আমার ১২৮ পাতায় শেষ হয়েছে। যদি বাড়াতে হয়, অন্তত ১৩৬ অব্দি যেতে হবে, আমি কি আটটা পাতা ভরানোর মতো কন্টেন্ট জোগাড় করতে পারছি? যতক্ষণ না সেইটা হচ্ছে ততক্ষণ সংস্করণের কাজ করতে পারব না।

অর্ণব: দেশভাগের ওপরে যে সংকলনটি তুমি করেছিলে, কবিতা এবং গানের সংকলন, সেই কাজটি কি কখনও ওপার বাংলার কবিতা-গান নিয়ে কাজ করার কোনো ইচ্ছা রয়েছে?

তন্ময়: ওপার বাংলার কাজ আমি ২০২২-তেই শুরু করে দিয়েছিলাম, সেটার ৮০ শতাংশ হয়ে গিয়েছিল ২০২৩ সালের মধ্যেই। তারপর থেকে দুই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অন্যান্য কারণে কাজটা করার উৎসাহ খানিক স্তিমিত হয়েছে এবং মনে হচ্ছে বর্তমান ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক আবহ যেমন, তাতে বইটি বার করার বা কাজটা করার উপযুক্ত সময় এটি নয়। কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি, এপার বাংলার মতো বিশাল ভলিউমের না হলেও একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজ ওপার বাংলার কবিতা নিয়ে করতে পারব।

অর্ণব: এখানে একটা প্রশ্ন করছি, সেটা হচ্ছে এর পরবর্তী কয়েকটা বইকে যদি দেখি— 'দীপাবলি নাকি শবযাত্রা', 'অবাঙ্‌মনসগোচর', 'পা কাটিয়া দিবার শতেক খেলাচ্ছল' এবং 'বাংলার ব্রত', এই চারটে বইকে যদি আমরা লক্ষ করি, দেখা যায় যে, কোনো বইয়েই সেকরম ভাবে গদ্যকবিতার কোনো প্রয়াস আমরা কবির থেকে দেখতে পাই না। গদ্য কবিতা থেকে এই যে সরে আসা, এটা কি ইচ্ছাকৃত? নাকি গদ্যকবিতা লিখতে চেয়েও এমন মনে হয়েছে যে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গদ্য বা কবিতা এই ফর্মগুলো একত্রিত হয়ে গেছে, আলাদা করে আমরা কোনো ফর্মকে ভাঙতে পারি না?

তন্ময়: গদ্য কবিতা বলতে আমি যা বুঝি, তা কি আমি লিখি না? নাকি তার তোয়াক্কা করি না? লিখি, মোটামুটি ধারাবাহিক ভাবেই লিখেছি। কিন্তু সেটা এখনও অবধি কবিতার বইয়ে না রাখার চিন্তা বা পরিকল্পনা

করেছি। বইয়ে যখন রাখব, সেই রাখাটা অত্যন্ত সচেতন পদক্ষেপই হবে।

অর্ণব: তোমার যে কবিতার ফর্ম, তা নিয়ে নানান এক্সপেরিমেন্ট দেখতে পাই, বিষয়ভিত্তিক জায়গা থেকে, লেখার প্যাটার্নের দিক থেকে এবং লেখার শৈলীর দিক থেকে, কিন্তু কোথাও কি তোমার গদ্য কবিতা না লেখার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট কারণ আছে? অথবা, গদ্যের মধ্য দিয়ে ন্যারেশন চেঞ্জ করেও একটা কবিতা যে লেখা যেতে পারে— সেই ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?

তন্ময়: দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আগে দিয়ে দিই, অবশ্যই লেখা যেতে পারে, এবং গদ্য কবিতা না-লেখার কথাটার সঙ্গে আমি সহমত নই কারণ আমি সংখ্যায় কম হলেও গদ্য কবিতা লিখি এবং লিখে চলেছি প্রত্যেক বছরই। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে কি কোনো কিছুর বিচার করা যায়? আমার মনে হয়, না।

আর্ণব: না আমি বিচার করতে চাইছি না। আমার প্রশ্নটা ছিল, এটাকী কনশাসলি খানিকটা এড়িয়ে যাওয়া নাকি...

তন্ময়: কোথায়? পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে নাকি কবিতার বইয়ের ভিত্তিতে? হ্যাঁ, কনশাসলি আমি পাণ্ডুলিপিতে রাখিনি।

অর্ণব: 'দীপাবলি নাকি শবযাত্রা' তোমার প্রথম কবিতার বই। এখন আর পাওয়া যায় না। এই বইটিকে কি পুনরায় বের করার কোনো ইচ্ছে আছে?

তন্ময়: না, যে বইটি সময়ের সঙ্গে পিছিয়ে গেছে সে বই আর পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন নেই। যদি পরবর্তীকালে নির্বাচিত কবিতা হয় তবে হয়তো এই বই থেকে কিছু কবিতা রাখব। কিন্তু বইটি ফিরিয়ে আনার আর কোনো পরিকল্পনা নেই। আমি যদ্দুর জানি 'বেইমানির যা-কিছু চিরাগ' বইটিও গত বইমেলায় দু-এক কপিই ছিল, ওই বইটাও বাজারজাত হবার থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যত সময় যায় পুরোনো বইগুলো আস্তে আস্তে হয়তো গুটিয়ে নেওয়া ভালো। প্রত্যেক কবিতার বইয়েরই অ্যাভেলেবল থাকার একটা নির্দিষ্ট আয়ু থাকে— সেই বইয়ের উত্তরাধিকার যদি বহন করতে হয় তাহলে বর্তমান বা নতুন বইটা হয়তো কোথাও গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কবির মনেও এবং বাণিজ্যিক ভাবেও।



অর্ণব: এটা আমার মনে হয় তোমার একটা খুবই ব্যক্তিগত মত। একটি বইয়ের আয়ু সম্বন্ধে একজন লেখক কি নিশ্চিত হতে পারেন?

তন্ময়: বইয়ের আয়ু আর বই বাজারজাত থাকার আয়ু বিষয় দুটো আলাদা।

অর্ণব: আমার মনে হয় তুমি তোমার ক্রিয়েটিভ লেখালিখির পাশাপাশি, বাজারের ব্যাপারেও অর্থাৎ বই যে একটি পণ্য এই ব্যাপারেও তুমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং তুমি বইকে শেষমেশ পণ্য হিসেবেই দেখতে চাও, তার বাজারদরকে এবং ফিনান্সিয়াল যে একটা অ্যাপ্রোচ বইয়ের প্রতি থাকে একজন প্রকাশকের তরফ থেকে, এটা নিয়ে তুমি যথেষ্ট...

তন্ময়: এটা নিয়ে আমার খুব স্পষ্ট একটা বক্তব্য আছে।

অর্ণব: হ্যাঁ, এই জায়গাটা যদি একটু বল।

তন্ময়: আমি কবিতার ক্ষেত্রেই বলি, নন-ফিকশনের তো বাজার আমি তীব্রভাবে বিশ্বাস করি, কবিতার ক্ষেত্রে আমি যখন কিছু কবিতা একত্রিত করে বই করছি, তখন সেই বই করার পেছনে প্রকাশকের ইনভেস্টমেন্ট থাকছে... এবার অনেকে বলতে পারে, প্রকাশক ইনভেস্ট করছে তার রিস্কে, তোমার কী চিন্তা, কিন্তু সেটা আমার মৌলিক চিন্তা যে, আমার কবিতার বই যখন কেউ ছাপাচ্ছেন, তিনি যেন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হন। তিনি লাভ করুন ছাই না করুন, তাঁর যাতে ক্ষতি না হয়।

আমি তো এমনি কবিতাগুলোই রেখে দিতে পারতাম— বড়োজোর পত্রপত্রিকায় বেরোত। কিন্তু আমি যখন দু-মলাটের মধ্যে বন্দি করে আনছি, বাজারজাত করছি, তার একটা বিনিময় মূল্য চাপছে, ফ্রিতে তো দিছি না আমি— আমার বইয়ের একটা মূল্য নির্ধারণ হবে সেটা জেনেই যখন আমি দিচ্ছি প্রকাশককে, তখন আমি চাইছি যে পাঠক পড়ুন। তার জন্যই তো আমি এই ফিজিক্যাল বইটা করছি। আমি কবিতাগুলো লিখেছি, কবিতাগুলো সাজিয়ে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি, সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশককে দিয়েছি, প্রকাশক বইটা করছেন। ফলে আমার কথাটা হচ্ছে, একটি বই কি শুধুমাত্র আমি নিজে দেখে খুব আপ্লুত হব সেইজন্য করছি? নাকি আমি যে বইটা করছি সেই বইটা মানুষ পড়ুক— সেটা চাইছি?

অর্ণব: কবিতা লেখার সময় কোথাও কি সচেতনভাবে পাঠকের বিষয়টা মাথায় কাজ করে?

তন্ময়: না, লেখার সময় সেটা একেবারেই করে না, সেই বিষয়টা মাথায় একমাত্র তখনই কাজ করবে যখন বইটি বাজারজাত হবে।

অর্ণব: আচ্ছা তোমার এমন কি কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, একটি বই তুমি হয়তো খুব যত্ন নিয়ে তোমার প্রায় সবটা উজাড় করে লিখেছ কিন্তু সেটা বাজারজাত হয়নি? এটাকি তোমাকে খুব হতাশা দেয়?

তন্ময়: 'দীপাবলি নাকি শবযাত্রা' তো প্রথমেই উইথড্র করে নিয়েছিলাম, ওটা বাদ দিলাম। পরের যে তিনটে বই— বেইমানি বা ব্রত বা অবাঙ— এই তিনটি বইয়ের ক্ষেত্রে আফসোসের জায়গাটা হয়নি, একটা আফসোস ছিল যে, অবাঙ-এর বইটা আমি আরও আগেই করতে পারতাম।

এখন যদি বাজারে বিক্রির দিক দিয়ে বলি আমার সবচেয়ে কম বিক্রি, 'দীপাবলি...' বাদ দিলে 'পা কাটিয়া দিবার শতেক খেলাচ্ছল'। বই আকারে বার করব যখন ভেবেছি, তখন থেকেই সেই ব্যাপারে আমি প্রস্তুত ছিলাম, কাজেই সেই ব্যথা বা কষ্ট আমার কাছে ততটা ধরা দেয়নি, যতটা সেই কষ্ট ধরা দিয়েছে 'ঈষাক্ষাৎকার'-এ।

অর্ণব: আচ্ছা, একজন বাংলা ভাষার কবি হয়ে তোমার কি মনে হয় যে অন্যান্য ভাষার কবিতা পড়া অথবা বাংলা কবিতা লিখতে গেলে ভারতের অন্যান্য ভাষায় কবিতা পড়া এবং বিদেশি ভাষার কবিতাও যথেষ্ট পরিমাণে পড়া জরুরি?

তন্ময়: একশোবার, যে-কোনো পাঠযোগ্য বিষয়ই পড়া জরুরি। যে-কোনো ভাষা, যে ভাষা আমার আয়ত্তে আছে, তা-ই পড়া উচিত। যে-ভাষা পড়ে আমি বুঝতে পারি না— যদি বুঝতে না পারি, তা যদি অনুবাদের মাধ্যমেই আমার কাছে এসে পৌঁছয়, সেটা পড়ব। সেটা কোনো উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ হতে পারে, উৎকৃষ্ট উপন্যাস হতে পারে বা উৎকৃষ্ট নন-ফিকশন হতে পারে— যে-কোনো পাঠই আমায় সমৃদ্ধ করবে।

অর্ণব: আচ্ছা কবিতা তো একধরনের ক্ষমতার কাউন্টার কালচার, তো সেই জায়গা থেকে সেই চর্চাটা আমরা কখনও খুব উচ্ছ্বসিত স্বরে করতে পারি, আবার কখনও খুব তরল স্বরে করতে পারি। এবং আমার মনে হয়, এই ক্ষমতার যে কাউন্টার কালচার যাকে আমরা অস্বীকার করছি, এই বিষয়টাকে কি কবিতায় লেখা ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য মনে হয়? বা তোমার কাব্যচর্চায় এই ধরনের কবিতা কি তুমি খুব



লিখতে চেষ্টা করেছ? বা তোমার কবিতায় যদি উঠে এসেছে কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে, তাহলে তুমি বলতে পারো।

তন্ময়: হ্যাঁ উঠে এসেছে, বাংলার ব্রত-তেও এসেছে, অবাঙ্মনসগোচর-এও এসেছে, পরবর্তী বইয়েও আসবে। সেই অর্থে বলতে গেলে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বলতে আমাদের বাঙালি কবিকুল বিগ হাউস পত্রিকা বোঝেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান তো কখনো কখনো সমাজও হতে পারে, সামাজিক গোঁড়ামিও প্রতিষ্ঠান হতে পারে, প্রতিষ্ঠান তো রাজনৈতিক শাসকও হতে পারে বা শাসকদলও হতে পারে, প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো কেন্দ্রও হতে পারে, কাজেই সেগুলো যদি কবিতার মধ্যে উঠে আসে বিনির্মাণের মাধ্যমে, আমি তো উচ্চকিত 'মেরে দাও কেটে দাও' লিখতে পারি না, যাঁরা লিখতে পারেন, সেই লেখা হয়তো সফল, কিন্তু নিজের ধারণা অনুযায়ী আমি আমার মতন উপাদান দিয়েই তা লিখি।

অর্ণব: বর্তমানে আমরা দেখি বহু কবি বিভিন্ন ভাষা এবং মূলত ইংরেজি ভাষার কবিতা তাঁরা নিয়মিত পত্রপত্রিকার জন্য অনুবাদ করে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতে কি তোমার এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে?

তন্ময়: সুবিমল বসাকের কালেকশনে বছর চার-পাঁচেক আগে একটা বই দেখেছিলাম, হিন্দি বই, যার নাম হচ্ছে 'কলেজস্ট্রিট কা মসীহা'। ৬০-এর দশকে লেখা, লেখক শরদ দেওড়া। বইটির তিনটে পর্ব ছিল, বইটা এত দারুণ লেগেছিল আমার, আমি খুব তক্কে-তক্কে ছিলাম যে বইটা একদিন আমি অনুবাদ করবই। বইটার তিনটে পর্বের মধ্যে একটা ছিল বিনয় মজুমদারকে নিয়ে, একটা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এবং একটা পর্ব ছিল হংরি জেনারেশনকে নিয়ে, অর্থাৎ কলকাতার সাহিত্যজগতের সে-সময়ের তিন আলোচিত উপাদান নিয়ে। আমি খুব আশায় ছিলাম যে বইটা অনুবাদ করব, বসাকবাবুর প্রয়াণের পর তাঁর বই-সংগ্রহ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বইটি আর খুঁজে পেলাম না। এ ছাড়া ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার আমি কোনো তাগিদ দেখি না তার কারণ অনেক বাঙালিই এখন ইংরেজি পড়তে পারেন। তাই আলাদা করে সেটার প্রয়োজন বোধ করি না, আমি অনেকবেশি প্রয়োজন বোধ করি বা করতে ভালবাসব সংস্কৃত

থেকে বাংলায়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার ততটা দখল নেই যেটা একজন অনুবাদকের থাকা উচিত। আর সত্যি বলতে গেলে বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া তো অন্য কোনো ভাষার ওপর আমার সেরম দখল নেই ফলে অনুবাদের জিনিসটা নিয়ে আমি কখনোই সিরিয়াসলি ভাবি না, একবারই ভেবেছিলাম ওই 'কলেজস্ট্রিট কা মসীহা' বইটার ক্ষেত্রে, কিন্তু সেই বইটিই খুঁজে পাচ্ছি না।

অর্ণব: এই সার্বিক কবিতার যে জগৎ বিশ্বসাহিত্যে, সেখানে তোমার কি কোনো কবির কবিতা এমন মনে হয়েছে যা তোমাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করেছে?

তন্ময়: ইন্সপায়ার যদি কেও করে থাকেন সেটা মাতৃভাষার কবিরা, ইংরাজি ভাষার কবিতা যেটা করেছেন সেটা হল ভিন্ন-ভিন্ন দিক খুলে দিয়েছেন, আরও সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু সেটা ইন্সপিরেশন আমার কাছে খুব একটা নয়, ইন্সপিরেশন বলতে গেলে আমি বিনয় মজুমদারের কথাই বলব, চার্লস বুকোস্কির কথা বলব না।

অর্ণব: আমরা যদি নব্বই-পরবর্তী বাংলা কবিতার দিকটা খেয়াল করি, প্রায় ৩৫ বছর হয়ে গেল যেখানে আমরা দেখতে পাই... স্টারডম বিষয়টাকে যদি আমরা মাথায় রেখে বলি যে এমন একজন কবি যে ধারাবাহিকভাবে ভালো লিখছেন এবং প্রায় আমাদের সমসাময়িক কাব্যচর্চার মধ্যে তিনি ভীষণভাবে অন্তর্দাহ ঘটিয়ে গেছেন, এরকম কোনো কবি আমরা সেরকম ভাবে খুঁজে পাই না। অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতার বই লিখেছেন আমরা এরকম বহু নাম বলতে পারি ১৯৯০-২০২৫ এই ৩৫ বছরে, যাঁদের বেশ কিছু বই আমাদের খুব ভালো লেগেছে কিন্তু তথাকথিত ধারাবাহিক চর্চার দিকটা যদি আমরা খেয়াল করি, যেটা আমরা ৫০-৬০এর দশকে ভীষণভাবে পেয়েছিলাম।

তন্ময়: যে-কবিতা চূড়ান্ত অন্তর্দাহ ঘটাবে পাঠকের মনে... অন্তর্দাহ কোন পাঠকের মনে ঘটাবে সেটাও উল্লেখযোগ্য, জয় গোস্বামীর একটা কবিতা ছিল না, 'ঠিক সময়ে অফিসে যায়? ঠিক মতো খায় সকালবেলা? টিফিনবাক্স সঙ্গে নেয় কি?...' ইত্যাদি, খুব জনপ্রিয়, যেটি অনেক মানুষ পড়ে চোখের জল ফেলেন ইত্যাদি কিংবা



'মালতীলতা বালিকা বিদ্যালয়'— সেগুলোও তো কোনো-না-কোনো পাঠকের মনে অন্তর্দাহ ঘটাচ্ছে। কাজেই অন্তর্দাহ বিষয়টি খুব বিতর্কিত এবং আপেক্ষিক, অন্তর্দাহ শব্দটা তুই যে অর্থে ব্যবহার করতে চাইছিস সেটা হচ্ছে, সিরিয়াস কবিতাপাঠে অভ্যস্ত ধারাবাহিক চর্চাকারী পাঠকের মনে অন্তর্দাহ। সেই কবিতা, যা একজন দীক্ষিত পাঠকের অন্তর্দাহ ঘটাবে, তা জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অর্ণব: আচ্ছা, কোনো কবি কি পপুলার হওয়ার মতো কবিতা লিখতে পারে? নাকি কবিতা লেখার পর সেটা পপুলার হয়ে যায়?

তন্ময়: আমি বলছি পপুলার হয়েছেন, আমরা পাঠকরাই বানিয়েছি, এখানে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যেটা আর কি সিনেমার ক্ষেত্রেও হয়, কমার্শিয়াল সিনেমার ক্ষেত্রে, একটা ফর্মুলায় সিনেমা বানিয়ে সেটাকে পপুলার করার চেষ্টা। এটা কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে হয় না, আমরা যদি ভাস্কর চক্রবর্তীর মতন কবিকেও দেখি তিনি 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' এই কবিতাটা কখনোই বিখ্যাত হবার জন্য লিখেছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই কবিতাটি অত্যন্ত বিখ্যাত একটি কবিতা।

অর্ণব: কিন্তু দেখো, তার পরবর্তী লাইনটা 'কে যেন ইয়ার্কি মেরে ব্যাঙের রক্ত/ ঢুকিয়ে দেয় আমার শরীরে' এই লাইনটি প্রায় কেউই জানে না। যাইহোক, পপুলার কালচরটি সামগ্রিক কবিতাকে কোথাও ক্ষুণ্ন করে?

তন্ময়: করে, কিন্তু করে বলার পরে আবার এইটাও বলতে হয় যে এই লাইনটি জন্য যদি ওই সামগ্রিক কবিতা ৫০০ জন মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে এবং ওই লাইনটি যদি ৫০০০ জন মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে তবে সেই ৫০০০ থেকে আরও ৫০০ জন মানুষ অন্তত ইন্টারেস্টেড হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি কবিতা পড়ে কখনো গোটা বই কিনে পড়েছি এমন বহু অভিজ্ঞতা আছে, অনেকেরই আছে, কাজেই আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে সিরিয়াস বাংলা কবিতার পাঠকের গণ্ডি বেড়ে চলা উচিত, বিনয় মজুমদারের কবিত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ হবে না কিন্তু কোনো উপাদান যেমন— 'ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?' বা 'আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুকাল হল'— এই লাইনগুলো পপুলার

হয়ে যদি বিনয় মজুমদার দশ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যান, তাহলে আখেরে ওই দশ হাজারের থেকে এক হাজার জন বিনয় মজুমদারের প্রতি কৌতূহলী হতে পারে— এই আশাবাদ থেকেই আমি একটি লাইনের জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করতে পারব না। আর আমি মনে করি উপরিতলে যদি অনেক ভার থাকে, তার থেকে কিছুটা অন্তত চুঁইয়ে নীচে আসেই, সেই চুঁইয়ে নীচে আসাটার দিকে আমি তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করি।

অর্ণব: বেশ, আমরা যদি বিশ শতাব্দীর কবিদের কাছে পৌঁছে যাই অর্থাৎ সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে কি কোনো পারফেক্ট কবির ধারণা যে অন্তত জীবনে একটি পারফেক্ট বই লিখে গেছেন? এই ধরনের প্রায় কোনো ত্রুটিহীন কবিতা...

তন্ময়: 'ফিরে এসো চাকা'।

অর্ণব: 'ফিরে এসো চাকা' এবং আমার কোথাও গিয়ে মনে হয় আরও কয়েকটি বই যেমন 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' একটি অপূর্ব পারফেক্ট বই। তো একজন কবির পারফেক্ট একটি কবিতার বই লিখে যাওয়া ভীষণ জরুরি, তুমি ব্যক্তিগতভাবে কি তোমার যে কটি বই হয়েছে কোথাও গিয়ে এই প্রয়াসটি সচেতন রাখতে চেয়েছ? পারফেক্ট শব্দটা, যদিও ওটা খুব বিতর্কিত এবং আপেক্ষিক শব্দ, সেইটা কি তোমার মাথায় কখনো কাজ করেছে? বই সাজানো বা পাণ্ডুলিপি সাজানোর সময়? লেখার সময় স্বাভাবিকভাবেই সেটা কাজ করা সম্ভব নয়।

তন্ময়: পাণ্ডুলিপি সাজানোর সময় করেছে কিন্তু দিনের শেষে আমি এটা বিশ্বাস করি যে একটা পারফেক্ট বই বলতে আমি যেটা কল্পনা করি সেটা হয়নি... একশো শতাংশ হয়নি।

অর্ণব: তুমি কি কখনো এমনভাবে পাণ্ডুলিপি সাজাতে চাও যেটা প্রজেক্ট হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ একটি বিষয়কে ভাবনাচিন্তা করে সেই বিষয়কে মাথায় রেখে একের পর এক নিরন্তর কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাওয়া?

তন্ময়: বিষয় শব্দটা যখন ব্যবহার করা হচ্ছে তখন তো 'বাংলার ব্রত' বলতেই হবে। আমাকে অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় একটা কথা বলেছিলেন,



কবিতার বই দুরকম হয়— কালেকশন অফ পোয়েমস আর বুক অফ পোয়েমস, 'অবাঙ্মনসগোচর' হচ্ছে কালেকশন অফ পোয়েমস, 'বাংলার ব্রত' হচ্ছে বুক অফ পোয়েমস। বুক অফ পোয়েমস একটা সামগ্রিকতাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে যেটা খুব ঘনসন্নিবিষ্ট সামগ্রিকতা, আর কালেকশন অফ পোয়েমস বইয়ের মুড অনুযায়ী থাকতে পারে কিন্তু তার মধ্যেও প্রচুর তরঙ্গ খেলা করতে পারে, কোনো একটি নির্দিষ্ট চিন্তাসূত্র দ্বারা বইটাকে বেঁধে ফেলা যাবে— সেটা ভাবা মুশকিল। যে-জন্য বুক অফ পোয়েমস সিরিজ কবিতার ক্ষেত্রে হওয়াটা সহজ বলে আমার মনে হয়।

অর্ণব: তোমার কি মনে হয় কবিতায় যথোচিত রহস্য রাখা ভীষণ প্রয়োজন?

তন্ময়: নিশ্চই, ভীষণ প্রয়োজন।

অর্ণব: সেই রহস্য তাহলে কি পাঠকের মনে একটি জটিল আবহ তৈরি করে না? তুমি কি চাও সেই পাঠক সেই জটিল আবহটি তৈরি করে এমন একটি সরলতায় পৌঁছে যাক, যেখান থেকে সে কবিতাটি পুনর্বার পড়ার চেষ্টা করে?

তন্ময়: হ্যাঁ চাই, কিন্তু সেটা আমি চাই আমার লেখার বিশ্বাসের জায়গা থেকে, একজন নিরপেক্ষ পাঠক হিসাবেও মনে হয় এই যে বাংলা কবিতার প্রতি দীর্ঘকাল ধরে অভিযোগ— সেই রবি ঠাকুরের আমল থেকে চলছে... 'কবিতা জটিল আর ভাল্লাগছে না, আগেকার কবিতাই ভালো ছিল'— সব প্রজন্মেই প্রায় এই কথা শুনি, তার কারণই হচ্ছে গিয়ে কবিতার মধ্যে আলোআঁধারির ছায়া খেলা করা। সেখানে কিছু কিছু কবিতা, যেমনটা বললি কবিতার মধ্যে রহস্যের কথা, কিন্তু কিছু কিছু কবিতার ক্ষেত্র-বিশেষে ডাইরেক্ট হওয়াটাও জরুরি, যাতে কবিতা রচনার যে উদ্দেশ্য সেটা সটান গিয়ে আঘাত করে। খুন তো বহু রকমের হয়, ছুরি দিয়ে হত্যা করে দেওয়াও একটা খুন, আবার স্লো-পয়জনিং করে ছ-মাস ধরে ধীরে ধীরে হত্যা করাও এক প্রকার খুন। অর্থাৎ দিনের শেষে কবি সেই খুনটাই করতে চান, কোন পথে করবেন সেটা তাঁর বিষয়। জয় গোস্বামী খুব সুন্দরভাবে, নিপুণভাবে তাঁর জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ফেজে দুইভাবেই খুন করতে পেরেছেন, তাই আমি জয়কে এত অ্যাডমায়ার করি।

অর্ণব: সিনেমা বা গান বা আরও কিছু যেমন পেইন্টিং— এ-ধরনের শিল্পগুলোর প্রভাব কি তোমার কবিতায় কখনও এসেছে?

তন্ময়: কবিতাকে প্রভাবিত করেছে কি না জানি নাম কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে, সেটার ছাপ পরোক্ষভাবে কবিতায় উঠে এসেছে। এইসব সিনেমা, গান, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও তার সঙ্গে আমার নন-ফিকশন চর্চার যে একটা সমান্তরাল এবং বিস্তৃত অভ্যাস রয়েছে, সেগুলো সবই প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সেগুলো আমাকে মানুষ হিসাবেই প্রভাবিত করেছে।

অর্ণব: বেশ, আমরা এই নির্মাণ প্রসঙ্গেই একটি কথা বলি, তোমার কি মনে হয়, এই যে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়, খুব বিখ্যাত কবিদের কবিতা অনেকখানি নির্মাণ-নির্ভর, এবং অনেকের কবিতায় কনট্রাস্ট। যদি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং উৎপলকুমার বসু বা মৃদুল দাশগুপ্ত এঁদের মধ্যেও দেখি, দেখা যায় যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় যতখানি অর্গানিক একজন কবি, কবিতা যতটা সহজাতভাবে এসেছে, সেই তুলনায় কিন্তু উৎপলকুমার বসু বা মৃদুল দাশগুপ্ত...

তন্ময়: সহজাতভাবে আসার পেছনেও নির্মাণটাকে অবচেতন মিশিয়ে ফেলার যে একটি বিপুল প্র্যাকটিস আছে, সেইটা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।

অর্ণব: এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, কবিতা কি শুধুমাত্রই একধরনের নির্মাণ চাতুরি? কারণ আমরা যদি বর্তমানে বহু কনটেম্পরারি বাংলা কবিতাকে দেখি, সেখানে দেখা যায় যে অসম্ভব ভালো যাদের স্কিল সেট আছে, বা যাদের নির্মাণ করার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রকট তারা কোনো-না-কোনোভাবে একটা কবিতাকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ফলে কবিতায় নির্মাণ কি ভীষণ জরুরি? অথবা, প্রচণ্ড সচেতন নির্মাণ কি একটি কবিতার যে অপ্রোচ সেটাকে খানিক নষ্ট করে দেয় না?

তন্ময়: কবিতা লেখার সময় নির্মাণ জরুরি না। তার আগের যে প্রস্তুতিপর্ব বা প্র্যাকটিসপর্ব, সেখানে নির্মাণের যে কৌশলগুলো আছে, সেগুলো যদি কারোর মধ্যে মিশে যায় তাহলে সেটা কবিতা লেখার সময় স্বতঃস্ফূর্ত উঠে আসবে। সেটার জন্য আলাদা করে নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। তখন বক্তব্যটা সেই কাঠামোর মধ্যে পড়ে যেতেও পারে নাও



পারে, কিন্তু সেটাকে আর নির্মাণ বলা চলে না, সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসে। কাজেই এরকম প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় নির্মাণ জরুরি নয়, কারোর যদি সেই দক্ষতা থাকে, সেই জ্ঞান বা স্কিল থাকে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা পরিমিতিবোধ— যে-কোনো নির্মাণই দিনের শেষে পরিমিতিবোধের শিক্ষা দেয় কবিতার ক্ষেত্রে— কতটা বলব, কতটা বলব না বা কীভাবে বলব, কীভাবে বলব না। যদি সেই পরিমিতিবোধের শিক্ষাটা চলে আসে তাহলে সেটা লেখার উপকার করে। কিছু ক্ষেত্রে অপকারও করে, কারণ একটা কাঠামোর মধ্যে খেলতে হচ্ছে, সেটা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই এই কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ব্যাপারটা ছড়িয়ে যায়। যারা ছড়িয়ে না গিয়ে রশি টেনে রাখতে পারে, সেটাও একধরনের পরিমিতিবোধ... পরিমিতিবোধ কি শুধু প্রসারণে আছে? সংকোচনে নেই?

অর্ণব: আচ্ছা এইবার যদি একটু কবিতার বইগুলোর দিকে তাকাই, মূলত 'দীপাবলি নাকি শবযাত্রা' অথবা 'বেইমানির যা-কিছু চিরাগ', সেখানে দেখা যায় যে তোমার কবিতার যে বৈশিষ্ট্য তার খুব ব্যক্তিগত একটা অন্তর্দাহ রয়েছে, প্রেম রয়েছে, যৌনতা, বিরহ রয়েছে; তাতে অসম্ভব এমন একটা রাগ রয়েছে আবার একই সঙ্গে প্রশ্রয় রয়েছে। সেই লেখাগুলোর ক্ষেত্রে যে ধরনের ফর্ম বা ডিকশন ব্যবহার করা হয়েছে, তা বাংলা কবিতার একটা প্রায় চিরাচরিত রূপ যা তোমার মতো করে তোমার ভাষায় বিবর্তিত হয়েছে। আমি বিশেষ কোনো লাইন উল্লেখ করছি না। কিন্তু তোমার যদি শেষ বইগুলো দেখা যায়— 'অবাঙ্মসগোচর', 'পা কাটিয়া দিবার শতেক খেলাচ্ছলে', 'বাংলার ব্রত'— এই তিনটি বইকে যদি আমি রাখি তাহলে আমার মনে হয় 'বাংলার ব্রত' এমন একটা জায়গায় অবস্থান করে যেটা প্রথম দুটো বইয়ের থেকে একটা ট্রানজিশনের ব্রিজ বা সেতু বহন করে। এই জার্নিটাকে তুমি যদি একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করো...

তন্ময়: হ্যাঁ, 'বেইমানির যা-কিছু চিরাগ বেরিয়েছিল ২০১৯-এ এবং 'অবাঙমসগোচর' বেরিয়েছিল ২০২৩-এ, এই সময় আমি সচেতন ছিলাম এটার পাণ্ডুলিপিটি আমি কীরকম বানাতে চাই এবং 'বাংলার

ব্রত'-র লেখাগুলি হওয়ার পর আমার যখন বই করতে ইচ্ছে হল তখন আমি বুঝলাম এই বইটি 'অবাঙ্মনসগোচর'-এর পরে করা যাবে না, তাই প্রকাশকাল হিসাবেও অবাঙ-এর ঠিক ৬ মাস আগে বেরিয়েছিল 'বাংলার ব্রত'। কাজেই আমি খুব সচেতনভাবেই, ওই জায়গাতেই ওই বইটা রাখতে চেয়েছি। যাতে 'বাংলার ব্রত' একটি ঢেঁকির মাঝখানের অংশটা হয়ে থাকে যার একপাশে থাকছে ওই দুটো বই, একপাশে এই দুটো বই।

অর্ণব: তার মানে এটা একটা হারমোনিও বটে।

তন্ময়: বটেই তো!

অর্ণব: সেটাই, সেটা একটা কবিতার বই হোক, নন্দনতত্ত্বের একটি চূড়ান্ত জায়গায় সেটি পৌঁছে গেলেও সেটি একটি প্রজেক্টও বটে।

তন্ময়: বই প্রোজেক্ট কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কবিতা তা নয়।

অর্ণব: আচ্ছা তোমার যে-কবিতাচর্চা, এবং সেই চর্চাটিকে ভেঙে সম্পূর্ণ একটা নতুন ফর্মের জন্ম দেওয়া যেমন আমি যদি 'পা কাটিয়া দিবার শতেক খেলাচ্ছল'-এর কথাই ধরি, বা সামগ্রিক কবিতাচর্চাটায় তুমি নিরীশ্বরবাদী হয়েও যেভাবে মিথোলজিকে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যে দীর্ঘ দিনের বন্দনা তার অভ্যাস, ঈশ্বরকে নানান রূপে দেখার, নানান লোককথা— এই যে জায়গাটাকে তুমি এক্সপ্লোর করেছ, এই চর্চাটা তোমাকে কবিতায় কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায়? এবং, কেন তুমি এই চর্চাটা গত চার বা পাঁচ বছর ধরে নিরন্তরভাবে একটি এমন ভাষায় করছ, যে-ভাষাটি চট করে খুব কলিউকাল নয়, যে ভাষাটির মধ্যে বহু তৎসম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়— এই ধরনের একটি ভাষার মাধ্যমেই তুমি করে আসছ?

তন্ময়: আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই। কিন্তু আমি একটি কথা বিশ্বাস করি যে হাজার হাজার মানুষরা যা বিশ্বাস করেন তাকে আমি অসম্মান করি না, যতক্ষণ সেটা খানিক যুক্তির গণ্ডিতে রয়েছে। এখন বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে গিয়ে, যে মানুষটি কবিতার রচয়িতা, সেই মানুষটি কবিতার রচনাকালের মুহূর্তে, ব্যক্তি-আমি নাও হতে পারে। কবিতায় একটি বক্তব্য, বা কবিতায় একটি বিশ্বাস, বা কবিতায় একটি উপস্থাপনা যদি ফুটে আসে, সেটি জাগতিক দৈনন্দিনতায় আমার বিশ্বাস নয়



হয়তো। সেটি ওই কবিতা রচয়িতার বা কবিতার চরিত্রের বিশ্বাস হতে পারে। কবিতার চরিত্রটিও যে কবিতার রচনার মুহূর্তে তন্ময় ভট্টাচার্য, তা না-ও হতে পারে। কবিতায় যদি 'আমি' উল্লেখ করি, সেই আমিটি আমি নাও হতে পারি। সেই আমিটি অন্য মানুষ হতে পারে, আর বাকি যে উপাদান... আমার মনে হয়েছে যেমন আমার লেখায় বিভিন্ন লোককথা বিভিন্ন ঈশ্বরের মেটাফর ইত্যাদি উঠে এসেছে— এটা আমার যে ধারণা, তা থেকে। অন্যরা ভালো বলতে পারবে।

অর্ণব: আমার যদি বোর্খেসকে পড়ি আমরা তার কবিতায় অনেক গ্রিক মিথোলজি প্রচুর। এমন এমন কিছু মেটাফোর দেখতে পাই যে, একান্তভাবেই আমরা যদি তার সেই বিষয়টার ওপরে চর্চা না করি, তাহলে আমরা সেটা বুঝতে পারব না। তো আমার মনে হয় একজন কবির এরকম কোনো দায় নেই।

তন্ময়: না, একেবারেই দায় নেই। আমার লেখায় যদি কোথাও ঈশ্বরের কথা বা সংস্কারের কথা উঠেও আসে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়, সেটা যে-সংস্কার বা যে-প্রচলিত ধারণা, আমার কবিতায় সেটাই হয়ে ওঠে না, সেটার কোনো-না-কোনো বিনির্মাণ আসে।

অর্ণব: একটা শেষ প্রশ্ন রাখছি— 'পা কাটিয়া দিবার শতেক খেলাচ্ছল' এই বইটিতে আমরা দেখতে পাই এক ধরনের শব্দের ব্যবহার, এক ধরনের ন্যারেশনের ব্যবহার, এই বিষয়গুলো তুমি কতখানি তোমার গত দশ বা পনেরো বছরের চর্চা দ্বারা প্রভাবিত বলে তুমি মনে করো এবং তোমার কি কোথাও গিয়ে মনে হয় যে, এই বইটিতে যে ধরনের শব্দের বন্ধন তৈরি হয়েছে, যে ধরনের শব্দকে তুমি ব্যবহার করেছ, সাধুভাষার অনেক প্রয়োগ ক্রিয়া পদের ক্ষেত্রেও সে-ধরনের প্রয়োগ আমরা প্রচুর দেখতে পাই এবং এই বইটি তোমার কোন ধরনের পাঠকের প্রতি নিবেদিত যদি তুমি একটু তোমার মতন করে বলো।

তন্ময়: গত ১০-১৫ বছরের চর্চা না, আমার বয়স তিরিশ বছর এবং আমার তিরিশ বছরের চর্চারই প্রভাব।

অর্ণব: এখানে কি তোমার পরিবার কোনোভাবে তোমাকে সাহায্য করেছে?

তন্ময়: সামগ্রিকভাবে, আমার পাঠাভ্যাস, আমার পরিবার, আমার যাবতীয়, মানে যে-কোনো লেখার পেছনেই। কোনো মানুষকে তো নির্দিষ্ট কিছু হঠাৎ করে প্রভাবিত করতে পারে না। একটা সার্বিক জার্নির ফসল হয় বেশিরভাগ জিনিস। তবে কোথাও একই সঙ্গে বলতে পারি, কোন ধরনের পাঠককে নিবেদিত সেটা বলার সাধ্য আমার নেই। তবে আমি হয়তো জীবনে আর দ্বিতীয় পা কাটিয়া... লিখব না, লিখতে পারব না বলছি না, লিখব না। কিন্তু আমি হয়তো জীবনে আর অনেকবার অবাঙ্মনসগোচর লিখব— বইটাই রিপিট করব বলছি না, তবে ফর্মের দিক দিয়ে চেষ্টা করব।



## কবিতাভাবনা

তন্ময় ভট্টাচার্য

যেভাবে একটি পাখি ঘুমগায়ে ওড়ে

ধাক্কা খায়, ঘোর ভাঙে, উড়ে চলে অভ্যাসের বশে
কারণও রয়েছে কিছু...
প্রকাশ্যে বলাই বুঝি সব?

বিবর্তিত হতে-হতে ডানাদুটো বদলে গেছে হাতে

লিখি তাই, না-উড়ে পারি না